

# ৰান আউট ৯৯

## শঙ্কৰলাল ভট্টাচাৰ্য্যেৰ গল্প

ব্ৰাভো! ওয়েল ডান মাইবয়। নেভাৰ মাইণ্ড দ্য ৰান আউট, আফটাৰ অল ইটস ক্ৰিকেট।

কোম্পানিৰ চেয়াৰম্যান আৰ্চি ম্যাকল্যাৰেন আমৰা হাত ঝাঁকাচ্ছেন আৰু এসব বলছেন। আমাৰ বাঁ-হাতে ম্যান অব দ্য ম্যাচৰ ট্ৰফিটা ধৰা, আৰু মনেৰ পৰ্দায় ক্ৰমাগত ওই ৰান আউটটা খেলে যাচ্ছে।

শালা সন্দীপ! দেখছিস যখন ক্ৰিজ ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেছি কী আক্কেলে গেড়ে বসে রইলি ক্ৰিজে?

হে ভগবান, শুধু একটা ৰানেৰ জন্য জীৱনেৰ প্ৰথম সেঞ্চুৰিটা খোয়ালুম! কেন, এগাৰো ৰানে দাঁড়ানো হাৰামিৰ বাচ্চাটা ওৰ উইকেট স্যাফ্ৰিফাইস করতে পারত না?

সাহেবের হাত এবার আমার পিঠে। দুটো মৃদু চাপড়। শুনলাম বলছেন, ইউ হ্যাভ ডান আস প্রাউড...ওয়...ওয়...ওয়টস ইয়োর নেম?

রান আউটটা ফের মনের পর্দায় দেখতে দেখতে বললাম, অপু অপু সেনগুপ্টা।

ইয়েস, ইয়েস, অপু সেনগুপ্টা।

আমি প্রাইজের টেবিল থেকে সরে এলাম। প্লেয়ারদের ভিড়ে মিশে যেতে চাইছি, হঠাৎ বৃদ্ধ চেয়ারম্যানের তরুণী স্ত্রী শেরিল এসে ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল—ওহ, ইউ আর আ পার্ফেক্ট ওপনার, যেভাবে দলকে টানলে। তোমার কিছু কিছু স্ট্রোক আমাকে মনে করিয়ে দিল দেশের মাটিতে দেখা ডেভিড গাওয়ারকে।

আমি শেরিলের হাতটা চেপে ধরেছি। বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাডাম। এ তো মস্ত কমপ্লিমেন্ট দিলেন আপনি।

আমার মনের চোখে আর কোনো রান আউট নেই। আমি শেরিলকেই দেখছি। হালকা নীল সুতির ফ্রকে নীল চোখ তরুণীর থেকে চোখ সরাতে পারছি না। আমার হাতে ধরা ওর দুধে-আলতা নরম হাতটা।

শেরিল বলল, আমি যতটাই খুশি আজ আমাদের ড্র অ্যাণ্ড ম্যাকবেরি কম্পানির জয়ে ততটাই দুঃখিত তোমার সেঞ্চুরি মিস-এ।

আমি হাতে ধরে রাখা ওর হাতটায় মৃদু চাপ দিলাম—তা হলে বুঝুন আমার কষ্টটা। ওটা পেলে আমি হয়তো আপনাকেই উৎসর্গ করতাম।

ওহ, রিয়েলি! আমার হাতের মধ্যে শেরিলের হাতটা কেঁপে উঠল। আমি ফের একটা চাপ দিলাম। এবার একটু বাড়িয়ে।

শেরিল হাসছে। হয়তো মনের চোখে দেখছে আমি সেঞ্চুরি কমপ্লিট করে শচীন তেগুলকরের মতো ওর দিকে ব্যাট তুলে ধরেছি।

আমি ওর হাতটা কিন্তু ধরেই আছি, যেন ক্রিকেট ব্যাট।

ও মাথা ঘুরিয়ে স্বামীকে খুঁজল, হয়তো এটাই বলতে যে, সেঞ্চুরি হলে সেটা ওকেই উৎসর্গ করা হত।

কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব ততক্ষণে বিয়ারের মাগ হাতে নিয়ে বিপক্ষের ফিলপট অ্যাণ্ড ফিপস দলের হেরো খেলোয়াড়দের সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত।

আমি ফের কী ভেবে শেরিলের হাতটা মৃদুভাবে ঝাঁকতে লাগলাম। আমার মনে আছে অফিসের বড়োবাবু মুখার্জিদার উপদেশ—গুলি মারো কাজকে, কাজ করে আর আমাদের কী হল? খেলতে হলে খেলে যাও ক্রিকেট মাঠে আর...

এই পর্যন্ত বলেই মুখার্জিদা থেমে যায়। কিন্তু যা বলার তাতেই বলা হয়ে যায়। ডু অ্যাণ্ড ম্যাকবেরিতে ওঠার লড়াই দু-জায়গায়। ক্রিকেট মাঠ আর...

তুমি যুবক আছ, ট্রেনি এগজিকিউটিভ আছ, ব্যাটিং-এর হাত আছে... মুখার্জিদা বলছিল এই সে দিনও।

আমি এখনও হাত ছাড়িনি শেরিলের। কে একটা বিয়ার এনে ধরিয়ে দিয়েছে মেমকে, সেটা নিয়ে ও বলল, ওয়ান ফর হিম, প্লিজ!

হিম মানে আমি, অপু সেনগুপ্টা, আজকের ম্যান অব দ্য ম্যাচ। বস্তুত  
আজকের ম্যান অন দ্য স্পট। চেয়ারম্যানগিল্লি খুব মৃদু সুরেলা গলায়  
বিয়রের রিকোয়েস্ট করল ঠিকই, কিন্তু সিসিএফসি মাঠে দাঁড়িয়ে ওঁর  
অনুরোধ মানেই তো আদেশ। বলার সঙ্গে সঙ্গে বিয়র হাজির; আমি হাত  
ছাড়ব না বলে বাঁ-হাতের ড্রিফটাই মাটিতে নামিয়ে রেখে বিয়রটা নিলাম।  
ডানহাতে শেরিলের ডানহাত ধরা। দু-জনে বাঁ-হাতে মাগ ঠোকাঠুকি করে  
ফেনাসুদ্ধ বড়ো বড়ো বিয়রের ঢোক গিললাম। বিয়রের ফেনায় মোটা সাদা  
গোঁফ হয়ে গেল মেমের।

ও বলল, ইউ ডিজার্ড আ ডিনার অ্যাট আওয়ার প্লেস।

এবার ও-ই যেন একটু ঝাঁকাল আমার হাত। বললাম, দ্য সুনার দ্য বেটার।

ও হেসে ফেলল, ডোনট রাশ! ডিনার তো বানাতে হয়।

স্মার্টলি বলে দিলাম, চেয়ারম্যানের ডিনার টেবিলের উদবৃত্ত খেলেই আমার  
চলে যাবে।

খুব জোরে হেসে উঠল শেরিল, ওহ ইউ আর আ বিগ এন্টারটেনার অন অ্যাণ্ড  
অব দ্য ফিল্ড।

প্ররোচনার সুরে চাপা কন্ঠে বললাম, বেটার অব ম্যান অন দ্য ফিল্ড।  
একবার নেমগুন্ন করে দেখুন।

ওকে, বলো কবে আসতে চাও। পরের শনিবার?

বললাম, কেন, আজও তো একটা শনিবার?

ওহ গড! তুমি মিকি সিঙ্গল নেবার মতন দৌড়োচ্ছ। সত্যিই আজ সন্ধ্যায় আসতে চাও?

বললাম, আমি নিরানব্বইয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে ভালোবাসি না, ম্যাডাম। তাতে রান আউট হলেও খেদ নেই।

শেরিল আমার হাত থেকে ওর হাতটা আলতো করে ছাড়তে ছাড়তে বলল, আই আগারস্টিয়াণ্ড। আজ তো দেখলামই।

আমি এবার প্যাভিলিয়নের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে শুনলাম শেরিল নীচু স্বরে ইনভিটেশন দিচ্ছে, তা হলে সাড়ে সাতটার মধ্যে এসে যাও। বাড়ির ঠিকানা জান তো?

রহস্যের হাসি হেসে বললাম, আমি তো ডু অ্যাণ্ড ম্যাকবেরির স্টাফ। দ্যাটস পাট অব মাই জব।

আমি প্যাভিলিয়নে ফিরতেই বিয়ের পর বিয়ের আসা শুরু হয়ে গেল। এটা কতটা খেলার জন্য আর কতটা শেরিল ম্যাকল্যারেনের সঙ্গে বিশ মিনিটের খোশগল্পের জন্য বুঝলাম না। টিম ক্যাপ্টেন ময়ুথ সেন এসে আমার আধ খাওয়া বিয়রটা হাত থেকে নিয়ে টেবিলে রেখে দু-টো হাত চেপে ধরল, তোর জবাব নেই, যা ব্যাটিং। আজ যেভাবে ধরেছিলি মেমের হাত। দে একটা চুমুই খাই ওই হাতে।

ময়ুথ ওই চুমুটাই খাচ্ছিল আমার হাতে যখন মিডলঅর্ডার ব্যাট চন্দন এসে একটা নতুন বিয়ের মাগ ধরল ঠোঁটে। আমি বিয়র গিলতে গিলতে শুনলাম

বলছে, শালা, বাঁচালি! আমি তো আজ বেড়িয়ে কাত! নে, এই কালীঘাটের  
সিঁদুর মাথানো রুপোর টাকা, তোর কাজে আসবে।

ও টাকাটা টুপ করে ফেলে দিল আমার বুক পকেটে।

আমি এবার ময়ূখ, চন্দন, রাকেশ, আনন্দ, প্রভুদের থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে  
বারের এক কোণে গিয়ে বসলাম। আর তখনই খেয়াল হল ম্যান অব দি ম্যাচ  
ট্রফিটা সেই যে মাটিতে নামিয়ে ছিলাম সেটা সেখানেই পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে  
লাফিয়ে উঠে আনতে যাব, দেখি সেটা পরমযত্নে বুক করে আমার জন্য বয়ে  
আনছে মুখার্জিদা!

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হংকার দিয়ে উঠল, বলিহারি ভায়া! যার জন্য  
বাইশ গজের মধ্যে অত ছোটোছুটি সেইটিই ময়দানে ফেলে চলে এসেছ। বলি  
মেমসাহেবের হাতের ছোঁয়া পেয়ে আদত জিনিসটাই ভুলে মেরে দিলে?

ইশ! হেঁকেমেকে এসব কী বলছে মুখার্জিদা? মেমসাহেবের ছোঁয়ামোয়া শুনলে  
বলবে কী লোকে? ওর হাত থেকে ট্রফিটা নিয়ে বললাম, তোমার মুখের কি  
কোনো আগল নেই মুখার্জিদা? কে কোথেকে কী শুনবে।

মুখার্জিদা একটা গোল্ডক্লেক ধরিয়ে আমায় পাশের চেয়ারে বসে গলা নামিয়ে  
বলল, কে আর কী বলবে? সবাই তো সেব দেখলে।

আমি ত্রাসের সঙ্গে বলে উঠলাম, কী দেখল সবাই?

মুখার্জিদা একটা লম্বা রিং ভাসিয়ে বলল, কেন, ওই মেমের হাত ধরে  
চটকাচটকি।

-ইশ, কী যে বল না তুমি।

—আমি আবার কী বলি? যা দেখি, তাই বলি।

—তোমরা দেখছি এবার আমার চাকরিটাই খাবে।

—চাকরি খাবে! কে? একবার মেম যার হাত নিয়ে খেলেছে, ক্ষমতা আছে সাহেবের তার চাকরি খাওয়ার?

আমি লজ্জায় পড়ে বললাম, যাঃ! কী যে বল না!

জোরসে ধোঁয়া গিলল মুখার্জিদা। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, এ আপিসে ছত্রিশ বছর হল আমার, যা বলছি শুনে যাও। এ মেম তো চতুর্থ পক্ষ, আমার সামনেই এক-একটা এল আর গেল। এর আগে কোনো গিল্লির এ খাতির দেখিনি। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা কিনা। জানবে এই মেমই তোমার মই। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছ?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি—কীসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

—অ্যাপয়েন্টমেন্ট, অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কীসের আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

—ব্রেকফাস্টের হতে পারে, লাঞ্চার হতে পারে, স্নেফ ড্রিঙ্কসের হতে পারে? হয়েছে?

—বেশ গর্ব হচ্ছে এ বার আমার। বলেই ফেললাম, হ্যাঁ, হয়েছে।

—হয়েছে? এবার স্তম্ভিত মুখার্জিদা। কীসের হল শুনি?

ছদ্ম নিরাসক্তির ভাব দেখিয়ে বললাম, ডিনারের।

আর যায় কোথায়। টিটোট্যালার মুখার্জিদা উত্তেজনার বশে আমার বিয়রের মাগ তুলে সপাসপ তিন ঢোক মেরে দিয়ে চঁচিয়ে উঠল, সেখুরি! সেখুরি!

আমি লাফিয়ে উঠে ওর মুখে তালু চাপা দিয়ে বললাম, চুপ! চুপ! মুখার্জিদা। মুখার্জিদা এবার ত্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, এই আমার খার্ড ভিক্টরি।

বললাম, তোমার ভিক্টরি মানে?

মানে প্রথমবার ছোটন বোসকে টিপস দিয়েছিলাম সাহেবের দ্বিতীয় গিল্লির বেলায়। সে কোন টং-এ উঠে গেছে দেখতেই পাচ্ছি। কমার্শিয়াল ম্যানেজার। সেকেণ্ড কেস রাজা চৌধুরি, এখন লগুনে পোস্টেড। ওই একই মই। এই চতুর্থ পক্ষটি কেমন হবে অ্যাডিন ঠাহর করতে পারছিলাম না। বড় সুন্দরী, বডড হাই ক্লাস। তার উপর নাকি ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটারদের সঙ্গে মাখামাখি ছিল। তাই তোমার খেলার সুনাম শুনে তোমার উপরই বাজি ধরলাম।

মনে হল অ্যালান ডোনাল্ডের বাম্পার গেল কানের পাশ দিয়ে। কী আবোলতাবোল বকছে মুখার্জিদা দু-ঢোক বিয়র টেনে। বললাম, আমার উপর আবার কী বাজি ধরলে মুখার্জিদা?

কেন, কোয়ার্টার ফাইনালে গন্টারমান অ্যাণ্ড পিপার্সের এগেনস্টে তোর ব্যাটিং দেখতে এসে ওই তিপাল্ল নট আউট দেখে বলে যাইনি তুই আমার বাজির ঘোড়া?

-বলেছিলে বুদ্ধি? আমি মনে করতে চেষ্টা করলাম।



—মনটা কোথায় থাকে তোমার, তেগুলাকর। স্পন্সরশিপে সই করে বেড়াছ  
বুঝি সর্বক্ষণ!

-খেলার মাঠ আর অন্য কী সব খেলাটেলা, মইটইয়ের কথা বলেছিলে মনে  
আছে। তা বলে বাজি...

পথে এসো খোকা, পথে এসো। সব মনে পড়বে।

বললাম, সে যাকগে। ব্যাপারটা কী খুলে বলো। অত পেঁচিয়ে বলার দরকার  
নেই।

মুখার্জিদা দুটো দুর্ধর্ষ রিং ছাড়ল। অনেকক্ষণ দেখল ভেসে যাওয়া রিং  
দুটোকে। তারপর তৃতীয় একটা ছাড়তে ছাড়তে বলল, বেড হার।

আমি চমকে উঠে বললাম, মানে?

মানে শেরিল ম্যাকল্যারেনকে বিছানায় নাও। ওর চোখ তোমায় চেয়েছে।

মুখার্জিদা দিব্যি স্মোক করে যাচ্ছে, আমি নই, খেপেছে তোমার মেমসাহেব।  
কাজেই স্ট্রাইক হোয়াইল ইটস হট।

আমি সত্যিই এবার হাল ছেড়ে দিয়েছি। মুখার্জিদা বাস্তবিকই ইনকরিজিবল  
রাসকল একটা। মুখে কিসসু বাধে না বুড়োর।

আমি এ সবই ভাবছি, মুখার্জিদা গুম মেরে বসে আছে। হঠাৎ খেয়াল হল, না,  
লোকটা তো মশকরা করার লোক নয়। খেলতে হলে খেলে যাও ক্রিকেট মাঠে  
আর... এই জ্ঞান তো ওরই দেওয়া। মুখার্জিদা প্রথম শুনিয়েছিল ওই বিজ্ঞান

বসের হাত থেকে কিসসু পাবে না, ওগুলো নিজের আখের গোছাতেই আছে। মেমের হাত ধরো। এই মুখার্জিদাই একদিন কে সি দাশের দোতলায় লুচি ভাঙতে ভাঙতে বলেছিল, বিলিতি কোম্পানিতে মেমেরাই সব। শুধু স্টাডি করো সেখানে পৌঁছাতে কী লাগে। ক্রিকেট, না ভালো বারটেণ্ডিং, না সারাফ্ফণ ফাইফরমাশ খাটার অফুরন্ত এনার্জি।

বলতে নেই, আজ যে মেমের হাত এতফ্ফণ চেপে ধরেছিলাম তার অনুপ্রেরণা কিন্তু মুখার্জিদার ওই সব বেমক্কা টিপস। না হলে আমি যে-অপু সেনগুপ্ত কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে এক দন্ডের বেশি দু-দন্ড কোনো মেয়ের চোখে চোখ রাখতে পারলাম না, দাদার সুন্দরী শালিটাকে সিস্টেম্যাটিক্যালি প্রপোজ করতে পারলাম না, সেই আমি কী করে এক চেয়ারম্যানের গিল্লির হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম অতফ্ফণ। কে জানে কেন কী ভেবে এগিয়ে গেলাম একটার পর একটা চার-ছক্কা হেঁকে। মনের কোনো অন্তস্থল থেকে কে যেন আশ্বাস জোগাচ্ছিল, মেমকে তুই পেয়ে গেছিস। এগিয়ে পড়। নো ব্যাকফুট। ওনলি কভার ড্রাইভ। দিস ওম্যান ইজ ফর ইউ। শি ইজ ইয়োস। ইয়োর সেফুরি।

আমি ভাবতে ভাবতে নিজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। চটকা ভাঙল মুখার্জিদার আলতো টোকায় শোন অপু তুই জানতে চাচ্ছিলি তোকে বাজির ঘোড়া ধরেছিলুম কেন। তাই তো?

মুখার্জিদা আমাকে তুমি করেই বলে, এখন দেখছি খুব স্নেহের সঙ্গে 'তুই' করে বলছে।

আমার বেশ উষ্ণতা জাগল ওর প্রতি। বললাম, বলো।

মুখার্জিদার মুখটা কীরকম কাল্নায় ভেঙে পড়ছিল। হাতের সিগারেট অ্যাশট্রেতে ঠুসে দিতে দিতে বলল, ছোটন বোস, রাজা চৌধুরিকেও টিপস দিয়েছিলুম। মই পেয়ে সড়সড় করে উপরে চড়ে গেল, এই মুখার্জিদার জন্যে কিসসু করলে না। তুই একটু দেখিস আমাকে বাপু।

মনে মনে ভাবলাম, তা হলে এই অভিসন্ধিতেই আমার উপর বাজি ধরা, টিপস সাপ্লাই? ঘোড়েল লোক তুমি চাঁদু।

মুখে বললাম, আমি আর তোমার কী করব? তোমার চাকরির আয়ু তো ছ-মাস। এক্সটেনশন চাও? সে তো এ কোম্পানিতে রদ হয়ে গেছে চার বছর হল।

মুখার্জিদা ফের সিগারেট ধরাল—সে কি আর জানিনে অপু? সে আমি চাইও না। তুমি

শুধু ডিনারের এক ফাঁকে আমার বড়ো ছেলেটার জন্যে মেমকে একটু বোলো। যা হোক। একটা ক্লেরিকাল লেভেলে যদি নিয়ে নেয়। এতদিন সার্ভিস দিলাম কোম্পানিকে, এইটুকু কি আশা করতে পারি না, বল? কিন্তু আমাদের হয়ে বলবেটা কে? যতো হালফিলে এগজিকিউটিভ শুধু নিজেদের জন্যে সাহেবদের কানে ফুসফাস করছে। কাজের নামে লবডঙ্কা। টাই-সুট পরে করিডোর দিয়ে দৌড়োচ্ছে সারাফ্ফণ। ফাইলে গন্ডা গন্ডা ভুল ছাড়ছে, আর আমাকে বলছে মেরামত করে দিতে। তুই তো জানিস এসব।

একেবারেই মিথ্যে বলেনি মুখার্জিদা। কোম্পানির এই নতুন এগজিকিউটিভ ব্রিড অতি খাজা, মুখেই জগৎ মারছে। যা সব দেখেশুনে আমি নিজেও মেমের হাত ধরার লাইন নিইনি কি? যদ্দেশে যদাচার। ইংরেজি সাহিত্যের একনিষ্ঠ

ছাত্রকে রাস্তা ধরতে হয়েছে ক্রিকেটের। দর্শনের বিখ্যাত অধ্যাপক বাবা  
জীবিত থাকলে হয়তো বারকয়েক ঘাড় নেড়ে বলতেন, অপু ইটস নট  
ক্রিকেট। এটা ঠিক নয়।

আমিও ঘাড় নাড়লাম, তবে হ্যাঁ বোঝাতে। বললাম, তুমি ভেবো না মুখার্জিদা,  
আমি সুযোগ একটা জুটিয়ে নেবই, আর বলে দেব তোমার ছেলের কথা।

মুখার্জিদা আমার হাত দুটো ধরে গদগদ স্বরে বলল, আমি জানি। তোর  
পরিবারের কথা তো শুনেছি। বিশেষ করে তোর বাবার কথা। তোর ভালো  
হোক, অপু।

আমি বিয়র শেষ করে উঠে পড়লাম। মুখার্জিদার অফার করা একটা  
সিগারেট ধরিয়ে।

বিকেল চারটে থেকে সাড়ে ছটা যে কী করে বেজে গেল আমি টের পাইনি।  
মাঠ থেকে সটান বাড়ি এসে মার হাতে ট্রফি দিয়ে স্নানে ঢুকেছিলাম। একটু  
উষ্ণ জলে স্নান সেরে হুসহুস করে পাউডার ঢাললাম সারাদেহে। তারপর  
খুড়তুতো ভাই পিন্টুদার বিলেত থেকে এনে দেওয়া মসিয়ুর রশা ওদ  
তোয়ালেংটা গালে এবং ঘাড়ে ভালো করে চড়ালাম। তারপর পুজোয় কেনা  
আকাশি নীল রঙের জন মিলার শার্ট আর ধূসর জিনসটা পরলাম। তারপর  
মেরুন রঙের টাই একটা গলায় ফাঁসিয়ে ভ্যান হয়সেনের মিডনাইট ক্ল  
ব্লেজারটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। এক নাম না জানা সুখ তখন পাখা  
মেলেছে মনের ভিতর। গুনগুন করে ভাঁজছি তখন বিটলসদের সেই চিরনতুন  
গান 'আই ওয়ন্ট টু হোল্ড ইয়োর হ্যাণ্ড। কখন মা একবাটি বোঁদে নিয়ে পাশে  
এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল নেই, ঘুরে গিয়ে ওঁর গালে চকাস করে একটা চুমু খেয়ে

দিলাম। মা অবাক হয়ে গিয়ে বলল, এই যে বললি সেখুরি মিস করেছিস!  
তাও এত ফুর্তি।

বললাম, সেখুরির গুলি মারো মা। আমি ম্যান অব দ্য ডে। আজ আমিই  
রাজা।

মার ধন্ধ আরও বেড়েছে—তার মানে?

তার মানে আজ আমি যা চাইব তাই পাব।

তা তুই কী চাইছিস শূনি?

আমি চামচে করে ঝটপট কয়েক স্ট্রাকে বোঁদেগুলো উড়িয়ে দিয়ে বললাম,  
স্বর্গ!

যখন আলিপুর রোডে চেয়ারম্যান আর্চি ম্যাকল্যারেনের বাড়ির গেটে এসে  
আমার বিজনেস কার্ড দেখিয়ে ঢুকছি তখন মার বড়ো বড়ো বিস্ফারিত চোখ  
আমার মনের চোখে ভাসছে।

যখন বাড়ির হলের সামনে কাচের মস্ত দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি তখনও  
সেই চোখজোড়া আমার মনের চোখে। হঠাৎ ঘোর কাটল দুপুরে শোনা সেই  
সুরেলা কন্ঠের ডাকে, হ্যালো ডিয়র! ইউ আর জাস্ট অ্যাজ পাংচুয়াল অ্যাজ  
আ স্পোর্টসমান। ইটস জাস্ট সেভেন

বলতে না বলতেই হলের গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকে পেলায় এক ঢং পিটিয়ে সাড়ে  
সাতটা বাজল। শেরিল ওর ওই অপূর্ব ডান হাতটা দিয়ে আমার গন্ধে ভরপুর  
ডান হাতটা ঝাঁকিয়ে আমাকে নিয়ে চলল ভিতরের দিকে। আমিও সেট,

হ্যাগুশেক শেষ হতেই ওর বাঁ-হাতটা ধরে ফেলেছি। এ জিনিস ছাড়তে আছে, বাব্বা:। সাফ্ফাং স্বর্গের মই। আমি একটু চাপও দিছি হাতে। আহা, কী সুখ!

দেখি শেরিল আমার নিয়ে এসে বসাল স্টাডিতে। দেওয়াল জুড়ে চামড়ায় বাঁধানো থাক থাক বই। এক কোণ থেকে হস হস করে নামছে স্লিট এয়ারকণ্ডিশনারের ঠাণ্ডা, মিষ্টি হাওয়া। দেখছি এদেশে শীতেও এসি লাগে সাহেব-মেমদের। আমি এটিকেট বজায় রাখতে বললাম, আপনার স্টাডিরুমটি অপূর্ব।

শেরিল খুশি হয়ে বলল, বলছ? তবে এটা আমার নয়, আর্চির স্টাডি। দেখো টেবিলে ওর সব স্যুভেনির। বয়সকালে ও-ও কিছু ক্রিকেট খেলেছে ইংল্যান্ডে। আর ওর খুব গর্ব যে ওর নাম হবছ মিলে যায় অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটিং গ্রেট আর্চি ম্যাকল্যারেনের সঙ্গে। আর জান তো ইংল্যান্ডে ছেলেবেলায় ওর প্রাণের বন্ধুটির কী নাম ছিল?

জিঞ্জোস করলাম, কী নাম?

সে ছেলে জীবনেও ক্রিকেট খেলেনি, পরে নামকরা বটানিস্ট হয়েছিল। নাম ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান!

অসম্ভব আমোদ বোধ করে আমরা দুজনেই এবার হা হা হি হি করে হাসতে শুরু করলাম। আর তখন বেয়ারা ম্দু নক করে ঘরে ঢুকে জিঞ্জোস করল, ম্যাডাম ড্রিঙ্কস?

ওহ হো! আমি তো তোমায় ড্রিঙ্ক অফার করতেই ভুলে গেছি। আমার দিকে চেয়ে বলে উঠল শেরিল। বলো, বলো, তোমায় কী অফার করব? ওর গলায় দারুণ উত্তেজনা।

আমি বললাম, আপনার ড্রিঙ্ক?

—আমি একটা জিন অ্যাণ্ড টনিক নেব।

—আমি একটা হুইস্ক-সোডা পেলেই খুশি হব।

শেরিল বেয়ারাকে বলল, সাবকো এক স্কচ অ্যাণ্ড সোডা। মেরা জো ইউজুয়াল।

বেয়ারা চলে যেতে বললাম, আমার চেয়ারম্যান কোথায়? তাঁকে দেখছি না।

শেরিল একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ওয়েল, টুডে ইজ স্যাটার্ডে। তোমার চেয়ারম্যানের ক্লাব নাইট।

তা হলে আপনি আমার জন্য বাড়িতে থেকে গেলেন।

শেরিল সঙ্গে সঙ্গে প্রোটেষ্ট করল, ওহ, নো, ডিয়র। আই অ্যাম অফুলি টায়ার্ড অফ ক্যালকাটা ক্লাব। একই মুখ, একই বাজে বকবক, একই রকম মদ গেলা। আর, ডোন্ট মাইগু মাই সেয়িং ইট, কী খারাপ ইংরেজি বলে ক্যালকাটার ব্যবসায়ীরা। আমি জানি না আর্চি কী করে ওই ইংরেজি সহ্য করে দিনের পর দিন। আমার তো মনে হয় আমি ইংরেজি ভুলেই যাব ওদের সঙ্গে থাকলে। শুনেছিলাম তোমাদের ফিলম ডিরেক্টর সটিয়াজিট রে অসম্ভব ভালো ইংরেজি বলতেন। কিন্তু আমি এসে ওঁকে পাইনি, উনি নার্সিংহোমে ছিলেন আর সেখানেই মারা গেলেন। পরে টিভিতে ওঁর ইংরেজি শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি।

বেয়ারা ড্রিঙ্ক বানিয়ে দিয়ে চলে গেল। আমরা নিজের নিজের গ্লাস তুলে চিয়র্স করলাম। আমি বললাম, তা হলে কী করে সময় কাটে বাড়িতে?

শেরিল একটু অবাক হল যেন—কেন, এত বই দেখছ। আমার রেকর্ড, সিডি আছে কয়েক হাজার। আমি পিয়ানোও বাজাই একটু-আধটু। আর এখন তো সারা বছর ক্রিকেট লেগে আছে। আমি শচীন তেগুলাকরের ব্যাটিং দেখি, যখন যেখানে খেলে।

আমি ভিতরে ভিতরে খুব অবাক হচ্ছি, আর খুশিও হচ্ছি। আমার উঠে গিয়ে হাত ধরতে ইচ্ছে করছে শেরিলের। অথচ বসে আছি উলটো দিকের সোফায়। কাজেই একটা মুড নিলাম। হইস্কিতে দুটো বড়ো চুমুক দিয়ে উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম বইয়ের তাকের সামনে। বুঝতে পারছি না কী বই খোঁজা উচিত আমার। তবু একটা রিস্ক নিলাম; বললাম, আপনার এখানে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর সনেট আছে?

হোয়াট! এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং? শি ইজ মাই ফেভারিট পোয়েট আফটার জন ডান অ্যাণ্ড জেরার্ড ম্যানলি হপকিন্স!—পুলকিত বিস্ময়ে ফেটে পড়ছে শেরিল।

আমি মনের ভিতর শুনতে পেলাম মুখার্জিদার উল্লাস, হররে! মার দিয়া ছক্কা! চালিয়ে যাও অপু! বেড হার! বেড হার! সেঞ্চুরি!

শেরিল উঠে এসে আমার সামনের এক ব্ল্যাক থেকে বার করে ফেলল এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, আর আমার হাতে লেদারবাউণ্ড ভল্যুমটা দিয়ে বলল, হিয়র!



আমি একটু অপ্রস্তুত হওয়ার ভাব করে বললাম, না, না, আমাকে কেন? আমি আপনার মুখে একটু ওঁর কবিতার রিডিং শুনতে চাই।

শেরিল অবাক হল, আমার রিডিং? কেন? বললাম, আমার হলে তো আপনাকেই উৎসর্গ করতাম। আপনি না হয় একটা রিডিং অফার করুন আমাকে।

আমার চালটা পছন্দ হয়েছে শেরিলের। বলল, দ্যাটস আ গুড ডিল। ঠিক আছে, পছন্দ করো কোনটা পড়বা।

আমি ঝটপট পাতা উলটে যেটা বার করে দিলাম তাতে ওর নীল, সামুদ্রিক চোখে যেন ঢেউ ওঠা শুরু হল। অনেকক্ষণ ধরে জিন অ্যাণ্ড টনিকটা খেতে খেতে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি নীরবে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে দিতে হইস্কি খেতে থাকলাম।

খানিক পর শেরিল নিজেই দুটো ড্রিঙ্ক তৈরি করল দু-জনের জন্যে। আমরা নতুন করে পানীয়ে চুমুক দিলাম। শেরিল বলল, আমার প্রথম স্বামী এড্রিয়ানের ওই কবিতাটা পছন্দ ছিল খুব। আমি আর কারও জন্য কখনো এটা পড়িনি।

জিঞ্জেরস না করে পারলাম না, কী হয়েছিল এড্রিয়ানের।

শেরিল গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে প্রায় অন্যমনস্কভাবে বলল, ফকল্যাণ্ডস যুদ্ধ থেকে ফেরেনি ও। শুধু ওর প্রিয় ক্যাসেটটা ফিরে এসেছিল, বিটলসদের 'আই ওয়ান্ট টু হোল্ড ইয়োর হ্যাণ্ড'।

আমার মনে হচ্ছে আমি আনন্দে, বিস্ময়ে এফুনি মরে যাব। ঈশ্বর জানেন কেন আমি আজ আফটারশেভ মাথতে মাথতে, টাই বাঁধতে বাঁধতে গুনগুন করে গেয়ে উঠেছি আমি 'আই ওয়ন্ট টু হোল্ড ইয়োর হ্যাণ্ড।

আমি জওহরলাল নেহরুর ভাষায় নিজেকে বলতে শুরু করেছি ভিতরে ভিতরে, 'দিস ইজ মাই ট্রিস্ট উইথ ডেস্টিনি। শেরিলের সঙ্গে আজকের এই সাক্ষাৎ নিয়তির রচনা। এ হতই, এ ললাটলিখন। আবার পরে পরেই কানে ভেসে উঠছে মুখার্জিদার টিপস, বেড হার, অপু। বেড হার।

আমি মনে মনে ওর বিছানা দেখছি। ওর পোশাক খুলে ফেলছি। ওকে আমার নিজস্ব ভেনাস করে এনেছি প্রায়...হঠাৎ শুনি শেরিল পড়তে শুরু করেছে কবিতাটা—

How do I love thee? Let me count the ways.  
I love thee to the depth and breadth and height  
My soul can reach...

একটু আগেই ও বলেছিল যে কবিতাটা প্রথম স্বামী এড্রিয়ান ছাড়া আর কারও জন্য পড়েনি। কিন্তু এই পাঠ শুনতে শুনতে কেন আমার মনে হচ্ছে এই পাঠ শুধু আমার জন্য...শুধু আমার জন্য?

আমি সিপ করছি হইস্কিতে ঠিকই, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ওর মুখ থেকে চোখ সরাসি না। শেরিল পড়তে পড়তে বই থেকে চোখ তুলতেই আমার চোখ খুঁজে পাচ্ছে। শুধু কবিতা নয়, ও আমার সঙ্গে কমিউনিকেট করছে চোখের ভাষাতেও। আর আমি? আমি ওর প্রিয় কবিতাটির প্রতি তত ধ্যান দিছি না যতটা দিছি শেরিলের চোখ, ঠোঁট, কণ্ঠস্বর, সোনালি চুল, নরম হাত, উন্নত বুক...আমি মনের চোখে ফের ওকে বিবস্ত্র করছি...

কীরকম মনে হল?—হঠাৎ শূনি শেরিলের গলা।

—অপূর্ব!

—অপূর্ব! ইটস অ্যান এক্সপিরিয়েন্স। আই রিয়েলি মিন ইট।

আমার হঠাৎ খুব ইচ্ছা হল এগিয়ে গিয়ে শেরিলের মুখটা দু-হাতের মধ্যে নিয়ে একটা চুমো দেওয়ার। আমি হুইস্কির গ্লাসে শেষ চুমুকটা দিয়ে দাঁড়িয়েও পড়েছি। শেরিল বলল, তুমি কি ডিনারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লে? না না, একেবারেই না। আমি আপনার হাত ধরব ভাবছিলাম, টু থ্যাঙ্ক ইউ।

শেরিল ছোট্ট হেসে বলল, ব্যাস? আর কী বলতে?

আমার গলা আটকে এসেছে। সত্যি তো! হ্যাগুশেক করে, থ্যাঙ্কস দিয়ে কী বলতাম? কী বলা উচিত? আই লাভ ইউ? আই উড লাইক টু কিস ইউ? লাভ মি শেরিল। আমার ভালোবাসো। তোমার ঠোঁট দাও। তোমার...

ক্রিং ক্রিং ক্রিং! চাপা স্বরে শেরিলের মোবাইলটা বেজে উঠল। কোথায় ছিল মালটা এতক্ষণ? দেখি সোফার পাশে ফেলে রাখা একটা ছোট্ট এরিকসন মোবাইল তুলে নিল শেরিল—হ্যালো! হ্যাঁ, বেশ কিছুক্ষণ। তোমার স্টাডিতে। হ্যাঁ, হুইস্কি। একটু কবিতা পড়লাম। দেরি। হবে? আমরাই ডিনার সারব? ফাইন। হ্যাঁ, দেখাব। বাই! লাভ!!

মোবাইলটা ক্লিক অফ করে শেরিল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার চেয়ারম্যান।

-সে তো বুঝতেই পারলাম।

—বলছিল তোমাকে আমার স্টাডিটা দেখাতে।

—আপনার স্টাডি এনি স্পেশিয়ালিটি?

—গেলেই দেখতে পারে।

এবার শেরিল এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে নিয়ে চলল ভিতরের দিকে ওর নিজস্ব স্টাডিতে।

মেহগিনি প্যানেল করা ছোট্ট স্টাডি, কোণে একটা ওয়র্ড প্রসেসর। বইয়ের তাকের সামনে, আশ্চর্য! ধূপবাতি জ্বলছে কয়েকটা। একি স্টাডি, না পূজার ঘর?

বইগুলোর আরও কাছাকাছি হতে দেখি যাবতীয় বই হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব নয়তো স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে। ক্রিস্টোফার ইশারউডের রামকৃষ্ণ অ্যাণ্ড হিজ ডিসাইপলস, রোম্যাঁ রোলানঁর দ্য গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ, সিস্টার নিবেদিতার দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স' হিম, স্বামীজির কমপ্লিট ওয়র্কস...

আমার গোটা দেহ শিরশির করছে। মেয়েটা কী? ওর কী ব্যাপার? মনে মনে ভাবছি এরপর কী জিজ্ঞেস করি? তাকিয়ে আছি বইগুলোর দিকেই, শুনি পাশ থেকে শেরিলের গলা —তুমি জিজ্ঞেস করছিলে না আমার সময় কাটে কী করে? এখন মনে হয় একটু আঁচ পাচ্ছ।

বললাম, হঠাৎ এই সব বই! আপনি কি গবেষণা করেন?

শেরিল বলল, না। এড্রিয়ানের মৃত্যুর পর জীবন যখন খাঁ খাঁ করছিল তখন একদিন আমার কাকার বাড়িতে আর্টের সঙ্গে দেখা। ওর তখন সদ্য

স্বীবিয়োগ হয়েছে। ও বলল ও একজন ভারতীয় দার্শনিককে পড়ছে। সোয়ামি ডিভেকানা। যোগ বিষয়ে ওঁর সব লেখা। ক দিন বাদে ও বেশ কয়েকটা বই এনে দিয়ে গেল আমাকে। আমি পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে বিভোর হয়ে গেলাম সোয়ামিজির রচনায়। যেদিন আর্চি ফের কলকাতায় চলে আসবে ছুটি শেষ করে, ওকে বইগুলো ফেরত দিতে গেলাম, শুনলাম ও এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়ে গেছে। চলে গেলাম এয়ারপোর্ট, সেখানেই বই ফেরত দিলাম আর ও করল বিয়ের প্রপোজাল। আমি ওকে না বলতে পারিনি।

কী করে, কী করেই যেন গোটা পরিবেশটাই বদলে গেল। কী বলতে চাইছি, আর কী বলে বসছি বুঝেই উঠতে পারছি না। শেষে তৃতীয় ড্রিংকের শেষে কীরকম নীরব হয়ে গেলাম আমরা। সেইভাবেই ডিনার শেষ হল। ডিনারের পর দু-জনে দুটো কনিয়াক নিয়ে ফের আর্চির বড়ো স্টাডিটায় গিয়ে বসলাম। শেরিল কার্ঠের বাস্র থেকে একটা ডাভিডফ সিগার বার করে ধরিয়ে দিল আমাকে। কনিয়াকের উষ্ণ আমেজ মাথায় ছড়াতে আমার মনে পড়তে শুরু করল মুখার্জিদার সব টিপস। ছেলের চাকরি। মেমকে বিছানায় নেওয়ার পরামর্শ। আমি একগাল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে সোজা হয়ে বসলাম। রাত সাড়ে নটা। সময় বেশি নেই। যা করার এখনই মুখার্জিদার ল্যাপ্সোয়েজে—ডু অর ডাই।

লস্রা নিস্কৃততা ভেঙে বললাম, আমার চেয়ারম্যানের মধ্যে তা হলে একটা আধ্যাত্মিক দিকও আছে।

শেরিল ঘাড় নাড়ল, নট রিয়েলি। ওর যখন যেটা ভালো লাগে তখন সেটা নিয়ে মশগুল হয়ে থাকে কিছুদিন। তারপ সব ছেড়েছোড়ে একেবারে অন্য রাস্তায়।

কোনো পার্মানেন্ট প্যাশন নেই বলছেন?—জিঞ্জেরস করলাম।

আছে, এই ক্রিকেট আর সন্ধ্যের মোদো আছা, বলল শেরিল। ওর গলায় কি একটা ফোভ ধরা দিল?

বাজিয়ে দেখার জন্য একটা টিল ছুড়লাম—আপনার কি মনে হয় উনি যথেষ্ট মূল্য বোঝেন আপনার? আই মিন...আই মিন...ডাজ হি ডিজার্ড ইউ?

শেরিল তো বটেই আমি নিজেও চমকে গেছি হঠাৎ ফসকে যাওয়া কথাটায়। আমার ভয় হল; এসব কী বলছি নিজের কোম্পানির চেয়ারম্যানকে নিয়ে?

শেরিল চমকে ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই অন্য দিকে দৃষ্টি মেলে সামলে নিল নিজেকে। মেমরা কি এইভাবেই রাগ দমায়ে?

শেরিল বলল, তা হলে আজ সন্ধ্যায় এখানেই বিদায় জানানো যাক?

আমার বুকটা ধক করে উঠেছে। চোখের সামনে ভাসছে মুখার্জিদার মুখটা। ওর ছেলের জন্য কোনো চেষ্টাই করা হল না। বলব বলব করে ঠোঁট কাঁপছে, কিন্তু কোনো শব্দ হচ্ছে না। আমার চাউনিও লক্ষ্য হারিয়েছে। মদ কি এতই উলটোপালটা করতে পারে মগজ?

হঠাৎ শেরিল বলল, তুমি কিছু বলতে চাইছ, অপু।

অপু! অপু! শেরিল আমার নাম ধরে ডাকল? তা হলে ও রাগ করেনি নিশ্চয়। তা হলে তো আমি...

হ্যাঁ, বলেই ফেললাম—শেরিল...(ইচ্ছে করেই আর ম্যাডাম বললাম না)...শেরিল, আমাদের কোম্পানির একজন সিনিয়র পার্সন মিস্টার শশী মুখার্জি রিটায়ার করছে শীঘ্রই...

শেরিল বলল, আই সি...

বললাম, ওর ছেলেকে ফার্মে নেওয়ার জন্য কি চেয়ারম্যানকে বলা যায়?

শেষের দিকে আমরা গলাটা প্রায় ভেঙে এসেছিল লজ্জায় আর কিছুটা আত্মধিকারে। মুখার্জিদা আমাকে ইউজ করল নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে। সব শালাই সমান। আমিও এক ইডিয়ট, যে যা বোঝায় তাতেই নাচি। ছি! ছি! একটা অসাধারণ সন্ধ্যাকে কোথায় এনে ফেললাম!

আমি চোরের মতো চোখ তুলে চাইলাম মেমের দিকে। ও বলল, অপু দিস আই নেভার ডু। অফিসের কারও জন্য কোনো ফেভার আমি আদায় করি না আর্চির কাছে। এটা আমার নীতি নয়, আর ও-ও এটা একদম বরদাস্ত করতে পারে না। আর্চি বলে যে ওর আগের স্ত্রীদের এইরকম আবদার রাখতে ওকে অনেক অন্যায় করতে হয়েছে আগে। ওর সেসব ভালো লাগেনি। সো...।

শেরিল ওর মুখ-চোখের ভাষা আর দুই সুন্দর হাতের মুদ্রায় বুঝিয়ে দিল এ ব্যাপারে ওর কিছুই করার নেই। আমি কনিয়াকের গ্লাস টেবিলে নামিয়ে লজ্জিত স্বরে বললাম, আই আণ্ডারস্ট্যান্ড।

আমাকে হলের দরজা পেরিয়ে সিঁড়ির দরজা অবধি এগিয়ে দিতে এসেছে শেরিল। দরজাটা খোলার আগে সৌজন্যের সুরে বলল, সরি অপু। এরকম একটা অনুরোধ না করে অন্য কিছু বললে ভেবে দেখতে পারতাম।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, শেরিল, এটা আমার কোনো অনুরোধই নয়। অফিসের একজন সিনিয়র লোক বলেছিল, তাই নিতান্ত বাধ্য হয়েই বলে ফেলেছি। এ আমি চাইনি। আমি চেয়েছিলাম, জান শেরিল, তোমার এই পরমাসুন্দর মুখটা আমার হাতের মধ্যে নিয়ে এই গোলাপি ঠোঁটে একটা দুটো তিনটে চারটে দশটা বিশটা ত্রিশটা এক-শোটা চুমু দিতে। যতক্ষণ না ওই গোলাপি ঠোঁট রক্তে লাল হয়ে যায়। তারপর তোমার গোটা শরীরটা জড়িয়ে ধরে তোমার বুক দুটো আমার বুকের মধ্যে পিষে ফেলে তোমার সমস্ত পোশাক ছিঁড়ে ফেলে তোমার নগ্ন শরীরে আমার সমস্ত কামনার জলছবি ছাপ ধরিয়ে তোমার মধ্যে লীন হয়ে গিয়ে...

—অপু! ইটস টেন। আর্চি যেকোনো মুহূর্তে এসে পড়বে। আমি চাই না দুপুরে ওই ব্যাটিং দেখার পর ও তোমার এই ড্রাক্স চেহারা দেখুক।

-ইয়েস ম্যাডাম, ইয়েস। আই অ্যাম মেকিং আ ফুল অব মাইসেলফ। আমি এফুনি চলে যাচ্ছি, ম্যাডাম। গুড নাইট!

শেরিল খুব উষ্ণভাবে ওর নরম হাতটা দিয়ে আমার হাতটা ধরল। কীরকম আবেগে জড়ানো কণ্ঠে বলল, খুব ভালো লাগল আজকের সন্ধ্যাটা। তোমার দুটো অনুরোধ রাখতে পারছি না। একটা রাখব, কথা দিচ্ছি।

আমি ওর চোখে চোখ রেখে প্রবল চাপ দিতে শুরু করেছি ওর হাতে। কথাটা বললেই ঝাঁপিয়ে পড়ব ওঁর ঠোঁটে, বুক, শরীরে...

ও বলল, আমি আর্চিকে বলব মুখার্জির ছেলের চাকরির কথা। টেক কেয়ার। গুড নাইট!



আর্চি ম্যাকল্যানেনের বাড়ির গেটের বাইরে এসে আলিপুরের লম্বা, অন্ধকার রাস্তাটাকে উইকেটের সেই বাইশ গজ মনে হল। আমি আপ্রাণ ছুটছি সেখুরির শেষ রানটার জন্য, কিন্তু হতচ্ছাড়া সন্দীপ এক চুল নড়ছে না। এই একটি রানের জন্য আমার অনন্ত ছুট যেন শেষ হওয়ার নয়। শেরিলের ঠোঁটের এক বিঘত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ে আমি রান আউট ৯৯।